রবীন্দ্র চেতনা ও আধুনিক বাংলা কবিতা

বিধানচন্দ্র দে

রবীন্দ্রানুসারী কবি সমাজ ও আধুনিক কবি সমাজ নামে যে দুই গোষ্ঠির কল্পনা করে থাকেন তার উদ্ভব প্রকৃত পক্ষে রবীন্দ্রনাথের আয়ুষ্কালের প্রান্তসীমায়। যদিও এই দুই নামে কবিদের সমাজ বিভাগ কতখানি যুক্তিসহ সে প্রশ্ন আজও অমীমাংসিতই থেকে গেছে। রবীন্দ্রনাসুসারী কবি সমাজ বলতে সমালোচকেরা সেই সব কবিদের কথাই বুঝিয়ে থাকেন, প্রসঙ্গে প্রকরণে যাঁরা রবীন্দ্রলোকের অন্তবর্তী। এই কবি মণ্ডলী কাব্যের উপকরণিক চিরন্তনত্বে বিশ্বাস রাখতে গিয়ে মূল্যায়নের নিজস্ব ধর্মকে অস্বীকার করেছেন। অথচ উপকরণিক চিরন্তনত্ব বলে কাব্যের ইতিহাসে কোনও কথা নেই। ক্রমবর্ধমান আত্মসংবিতের আলোকে কবিমানস বারে বারে কাব্যের চিরন্তন মান নির্ণয় করে। এবং এই পথেই তাঁরা আধুনিকত্ব অর্জন করে। তিরিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে বাংলা কাব্যের নতুন পর্যায়ের রেখাপাত হতে থাকলে রবীন্দ্রানুসারী কবি সমাজের সঙ্গে তাঁদের পার্থক্য এই ক্ষেত্রে প্রথমে স্পষ্ট হয়ে উঠলো। আধুনিক কবিদের রচনা তার যাত্রারম্ভেই যে প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিলো তার মূল কথা হলো 'এ কাব্য প্রথানুগত নয়'। রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্রের সংকলনের নবম খণ্ডে হেমন্তবালা দেবীকে লিখিত পত্রে ইয়ুক্যালিপটাস গাছে কোকিল ডাকার সংবাদ জানিয়ে কবি বলেছেন যে কোকিলটা বোধহয় আধুনিক। সনাতনি কোকিল হলে সে বোধহয় বেছে নিতো আপন প্রেরণায় কাব্যখ্যাত বকুল। এই নির্দেয় পরিহাসের ভিতরে আধুনিক বাংলা কবিতার প্রথম অভ্যর্থনার রূপ অনেকটা প্রতিবিম্বিত। অথচ ওই খণ্ডের পত্র সংকলনেই আর একটি সংবাদ কবি দিচ্ছেন যার তাৎপর্য তখনই বোঝা যায়নি। 'পরিশেষ' কাব্যগ্রন্থের পর 'পুনশ্চ' প্রকাশিত হলেও 'পুনশ্চে' রই প্রথম সংস্করণ দ্রুত নিঃশেষিত হয়েছিলো। সে তুলনায় 'পরিশেষে'র বিক্রয় ছিলো অনেকটা ধীরগতি। প্রথম সংস্করণ তখনও অনিঃশেষিত। 'পুনশ্চ'রূপ প্রকরণগত অভিনবত্ব কাব্য-পাঠকদের আনুকূল্য অর্জনে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। এ সংবাদে বাঙালি কাব্য-পাঠকের মানসিক জাড্য সম্বন্ধে দুর্মর কিংবদন্তি অনেকটা শিথিল হয় বটে, কিন্তু তিরিশের আধুনিক কাব্যের উন্মেষ পর্বে অ্যাভারেজ বাংলা কাব্য-পাঠকদের বিমুখতার কথা ভাবলে সে আনন্দ অচিরে ম্লান হয়ে যায়।

অবশ্য এ বিমুখতার কারণ আধুনিক কবির অভিজ্ঞতার জটিলতা ও দুরূহতা। 'পুনশ্চের প্রকরণগত নতুনত্ব নিঃসন্দেহে অভিনবত্বের স্বাদ দিয়েছে। কিন্তু আধুনিকতার অন্তর্দৃঢ় জটিলতাকে দেখায়নি। 'পুনশ্চ' 'শেষ সপ্তক', 'শ্যামলী', পত্রপুটের তুলনায় রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি- 'বলাকা পর্ব এবং অন্তিম পর্ব অনেক বেশি আধুনিক কাব্য। আধুনিক কবিকে বিচারের কালে আমরা দেখি যে দৃশ্যমান, ক্রয়মাণ এবং অনুভূতিগম্য বাস্তবতাকে তিনি একই সঙ্গে দুই দিক থেকে আলোকিত করেন। বস্তুত এই দুই প্রান্তীয় আলোক সম্পাতের ফলেই তাঁর কবিতায় আলো-ছায়ার গভীরতার স্তরগুলি ভিন্ন তাৎপর্য পায়। আধুনিক কবি তাঁর অন্তবর্তী এবং বাস্তবতাকে তিনি একদিকে দেখে থাকেন বৃহত্তর বাস্তবতার অংশ হিসাবে। আর একদিকে দেখে থাকেন ক্ষুদ্রতর নানা বিপরীতের সমষ্টি হিসাবে। এই দুই আলোকের বর্ণমিশ্রণে চিরদিন কাব্য আধুনিকতার তাৎপর্য পায়। আমাদের উল্লেখিত দুই পর্বে রবীন্দ্রনাথের কবি-ব্যক্তিত্ব এই দুই আলোক ছটার যুগপৎ বিচ্ছুরণ ঘটিয়েছে। কিন্তু অন্যত্র তিনি সম্মুখস্থ বাস্তবতাকে যতোটা বৃহত্তর বাস্তবতার অংশ হিসাবে বিবেচনা করেছেন ততোটা নানা ক্ষুদ্রতর অংশের সমষ্টি হিসাবে দেখেননি। রবীন্দ্রনাথ অরূপের কবি, আনন্দের কবি

প্রভৃতি জনশ্রুতিগুলি এই অযত্নের আগাছা। তার মানে এই নয় যে রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে অরূপ আনন্দ অথবা প্রশান্তি প্রভৃতি অভিধার কোনও ব্যক্তিগত তাৎপর্য নেই। আমাদের বলার কথা এই যে ব্যক্তিগত তাৎপর্যই আছে- এগুলিকে নির্বিশেষ তাৎপর্যে বিশ্বাস করার কোনও হেতু নেই। 'দুঃখের তিমিরে যদি জ্বলে তব মঙ্গল আলোক তবে তাই হোক'- এখানে মঙ্গল আলোক শেষ কথা বটে- আসল কথা দুঃখের তিমিরের যন্ত্রণা। নিজ জীবনের অন্তবর্তী এই তিমির-চেতনাই রবীন্দ্রনাথকে আধুনিক কবির চরিত্র দিয়েছে। প্রত্যেক বড়ো কবি এই তিমির-চেতনার এবং আলোক চেতনার উপরে দাঁড়িয়ে জীবনের দ্বান্দ্বিক সমগ্রতাকে ধারণ করেন। সেই পথেই তিনি অর্জন করেন মহাকবির অভিজ্ঞান।

তথাপি রবীন্দ্রনাথের সমস্যা আর তিরিশের আধুনিক কবির সমস্যা এক কথা নয়। প্রশান্তিকে আত্মস্থ করাই রবীন্দ্রনাথের কবি জীবনের উদ্দেশ্য। তিরিশের আধুনিক কবির সমস্যা ছিলো ভিন্নতর। চতুর্দিকে আকীর্ণ অশান্তিগুলিকে অন্বিত করে তুলেই তিনি চেয়েছেন চিন্তার সমগ্রতা সৃজন করতে। ভাবের সমগ্রহতা ছিলো রবীন্দ্রনাথের অনুসন্ধেয়, চিন্তার সমগ্রতা হলো এ কালের কবিদের বিষয়। আধুনিক কবিদের ত্বরান্বিত জিজ্ঞাসা জটিলতা এই বিষয় ভাবনার বুনিয়াদ এবং মূল কাঠামো গড়ে তুলেছে। এই স্বতন্ত্র স্বক্ষেত্র গড়ে তুলতে গিয়ে আধুনিক কবিরা সচেষ্ট ভাবেই শ্যামল রবীন্দ্রনাথের দুর্নিবার আগ্রাসী আলিঙ্গনকে এড়িয়ে যেতে চেয়েছেন। এবং এক্ষেত্রে বাঙালি আধুনিক কবির ভূমিকা ছিলো ইংরেজ কবির থেকে অনেক বেশি দুরূহ। এলিয়ট প্রমুখকে যে কাব্য সংস্কার ভাঙতে হয়েছে তা ইংলন্ডীয় রোমান্টিক পুনরজ্জীবনের কবিদের স্মৃতির উত্তরাধিকার। এ উত্তরাধিকার যতো দুর্মরই হোক, কালের হাতে তার ক্ষয় শুরু হয়ে গিয়েছিলো নিঃসন্দেহে। আধুনিক বাঙালি কবিদের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ তো শুধু স্মৃতি মাত্র ছিলেন না ছিলেন একটি উজ্জ্বল উপস্থিতিও। আধুনিক বাঙালি কবিদের সক্রিয়তা যখন শুরু হয়েছে তখনও রবীন্দ্রনাথ পূর্ববর্তী হয়ে যাননি। এ কারণেই প্রতিঘাত জনিত আক্ষেপ বাংলা আধুনিক কাব্য সাহিত্যের প্রথম দিকে এতো তীব্র হয়ে উঠেছিলো। আধুনিক বাঙালি কবি প্রথম থেকেই এই কথাটা বুঝেছিলেন যে তাঁর সমস্যা কবি-সার্বভৌম হবার সমস্যা নয়। তাঁর সমস্যা প্রকৃতপক্ষে সাবালকত্ব অর্জনের সমস্যা। সে কারণেই এই কাজ তাঁদের কাছে কখনই একটা নেতিমূলক কাজ বলে প্রতিভাত হয়নি। এ ছিলো আসলে রবীন্দ্রনাথের ধ্যানের নীলিমা থেকে বেরিয়ে মননের উষালোকে যাত্রা। অবশ্য অভিজ্ঞতার নিজস্ব বাণীরূপ রচনার এই পথে সমগ্র চৈতন্যের অভিব্যক্তি বাসনা কার ক্ষেত্রে কতোখানি কাজ করেছে সেই মূল্যায়নের নিরিখেই কবিদের ব্যক্তিগত ও সামগ্রিক সার্থকতা নির্ধারিত হবে। আমরা জানি সত্যেন্দ্রনাথের সূত্রপাত হলেও মোহিতলালে এবং যতীন্দ্রনাথেই এই কাব্যমুক্তি সাধনার পূর্ব ইতিহাস লিখিত হয়েছে। সেই তখনই, যতীন্দ্রনাথের কবি জীবন প্রত্যেক্ষের লবণাক্ত জল-হাওয়ার জন্য আন্তরিকভাবে আকুল হয়ে উঠেছিলো। কিন্তু আকুলতা একা একা বড়ো শিল্পের জননী হতে পারে না। যতীন্দ্রনাথও পারেননি। তবু তিনি তাঁর সতীর্থদের মধ্যে কথ্যভাষার শক্তিকে বুঝেছিলেন গভীরতার তাৎপর্যে। তাই তাঁর রবীন্দ্র-প্রতিরোধ কোনও কোনও কবিতায় তারকনাথের বঙ্কিম-প্রতিরোধকে স্মরণ করিয়ে দিলেও যতীন্দ্রনাথ বাংলা কবিতার দিক পরিবর্তনের ব্যাপারটিকে হৃদয় দিয়ে যতোটা বোঝা চলে ততোটা বুঝেছিলেন এ কথা মানতেই হবে। এইখানেই তাঁর গুরুত্ব।

আধুনিক কবির ক্ষেত্রে কবিদের নতুন অভিজ্ঞতার প্রশ্নটি ধীরে ধীরে গভীরভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠলো। জীবনের প্রবীণতা সাহিত্যে প্রতিফলিত করতে হলে যে ভাব প্রতিভা বা প্রজ্ঞা বহির্মুখী চেতনারাশির উপর কাজ করে মহৎ কবিতার জন্ম দেবে তার জন্য অধ্যবসায়ী অন্বেষণও নানা প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে।

জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ, অমিয় চক্রবর্তী ও বিষ্ণু দের চিন্তায় ও কবিত্বে সেই প্রশ্নের স্পষ্টতা আমরা তিনের দশকের শেষের দিকে লক্ষ্য করেছি। সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় যে পাথুরে গৈরিক রঙে বর্ণবিভাস আমাদের কাছে নিয়তিকল্প কালকে মূর্ত করে তুলছে, তা নিঃসন্দেহে অনিবার্যভাবে রবীন্দ্র পোষিত বিশ্বাসের বিপরীত মন্ডলের বিষয়। বসন্ত ও বর্ষায় দুই বাহুতে জীবনের যে বৈভব রবীন্দ্রনাথ দেখেন, কালেরই তাড়নায় জীবনান্দ সেখান থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নেন- চলে আসেন হেমন্ত এবং কুয়াশার স্নান স্থিরতায়। সুধীন্দ্রনাথের মধ্যে যে অস্থিরতা তা কোনও অর্থেই রবীন্দ্রনাথের গতি স্পন্দিত অস্থিরতা হতে পারলো না অভিজ্ঞতার পট পরিবর্তনের কারণে। আবার জীবনানন্দের ভিতরে প্রশান্তির আকাঙ্খা যদি থাকেই তবে তাও রবীন্দ্রনাথের শান্ততার সধর্মী নয়। উত্তর সামরিক মানুষের পক্ষে রবীন্দ্রনাথের শুভাশুভের ধারণায় অংশভাগ হওয়া যে অসম্ভব এ কথা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সুধীন্দ্রনাথ ও জীবনানন্দ ভেবেছেন। তাই এঁদের কাব্য সাধনার একটা বড়ো অংশে থেকে গেছে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক কোন স্তরে এবং কোন ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হবে সে সমস্যার যন্ত্রণা। এ অনুমান অসংগত নয় যে সুধীন্দ্রনাথ এই সমস্যার পীড়নেই শেষে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। জীবনানন্দ জেনেছিলেন যে এই পৃথিবীর রস রক্ত সফলতা সত্য তবু শেষ সত্য নয়। রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করে জীবনানন্দ খণ্ড সত্য ও পরম সত্যের চিরদ্বন্দ্বের যন্ত্রণা থেকে উত্তরণের দিশা পেয়েছিলেন বলেই হয়তো শেষ পর্যন্ত তিনি সচেষ্ট ছিলেন। বুদ্ধদেব বসুর এই কথাটি খুবই ঠিক যে তিনের এবং চারের দশকের বাঙালি কবির প্রধান সমস্যা ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু এই সমস্যা রবীন্দ্রনাথকে এড়িয়ে যাবার সমস্যা নয়। সমস্যাটা হলো রবীন্দ্রনাথকে ব্যবহার করার সমস্যা। তাঁকে কোন কবি কোন সম্পদ বলে বিবেচনা করেন, সেটাই এক্ষেত্রে আসল কথা। অমিয় চক্রবর্তী অথবা বিষ্ণু দে কেও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সম্বন্ধের প্রশ্নটি নিজ নিজ কবি জীবনের পরিণতির টানেই নতুন ভাবে ভেবে দেখত হয়েছে। বস্তুত কে কেমনভাবে রবীন্দ্রনাথকে গ্রহণ করেছেন, এও এঁদের বিচারের বেলায় একটি কষ্টি পাথর।

পক্ষান্তরে চারের দশকের তরুণতর কবিদের কাছে রবীন্দ্র- সম্পর্কের সমস্যাটি আর তেমন করে অনুভূত হয়নি। রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী বাংলা কবিতার পঁচিশ বছরের ইতিহাস আলোচনায় এ কথাটি দুঃখাত্মক সত্য যে তিরিশের কবিরা যেমন রবীন্দ্রনাথের মহৎ ঐতিহ্যের পটভূমিকেই নানাভাবে ব্যবহার করলেন, চারের বা পাঁচের দশকের কবিরা সেক্ষেত্রে আধুনিক কাব্যের পুরোধাদের পটভূমিকেই ব্যবহার করার সুযোগ লাভ করে কিছুটা আলস্য মন্থর হয়ে পড়লেন। তরুণতর কবিদের পক্ষে এটা কোনও দিক দিয়েই মঙ্গলের হয়নি। কিন্তু সে আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্বে ওই আমাদের জানা দরকার যে রাবীন্দ্রিক ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিকতার নিজস্ব সমস্যাকে গ্রথিত করে প্রধান কবিরা কে কেমনভাবে কী ভেবেছেন।

আধুনিকতার সমস্যা তিনের দশকের কবিদের বিব্রত করেছে, আলোড়িত করেছে। ইতিপূর্বে এলিয়টিয় কাব্যের মাধ্যমে আবেগের নতুন অবয়ব যখন গড়ে উঠেছে আধুনিক বাঙালি কবিদের কেউ কেউ তখনই মুক্তির বিষয়টাকে সেই আলোকেই বিবেচনা করছেন। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এবং বিষ্ণু দে কাব্যের সার্থকতা বিবেচনায় সেই তাৎপর্যকেই গুরুত্ব দিয়েছেন। 'ওয়েস্ট ল্যান্ড' কাব্যে কবির দীপ্যমান ইমোশন কোনও ব্যক্তিগত নিভৃত ইমোশন নয়। নিজ অহম্ এর হাত থেকে মুক্তি নিয়ে কবি এখানে জাগতিক দৃষ্টিকে অধিগত করেছেন। নিঃসন্দেহে ইতিহাস চেতনা এক্ষেত্রে কবির বড়ো সহায়। এলিয়টের সুবিস্তৃত সংকট চেতনা যে কাব্যবৃত্ত সৃজন করলো তার ফলশ্রুতিতে প্রমোদ প্রদান লক্ষ্য ছিলো না, লক্ষ্য ছিলো না কাব্যের কুহক রচনা। এলিয়ট চেয়েছিলেন তাঁর সার্বিক আত্মসংবিতের গহন ভাষাকে মুক্তি দিতে। এই ভূমিকা পালন করার জন্যই কবিকে প্রস্তুত হতে হয়- প্রস্তুত হতে শিখতে হয়। নিজের ব্যক্তিগত ভালো লাগা মন্দ

লাগার আবেগময় আকর্ষণের হাত ছাড়াতে হয়। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এবং বিশেষ করে বিষ্ণু দে আধুনিক কবির এই খ্যাতির অর্জনের জন্য সবিশেষ মনোযোগী হয়েছিলেন। সেই অর্থে বিষ্ণু দে-র টয়াঠুংরী' যথার্থই এ কালের কবিতা এখানে কবির যিনি নায়ক, তিনি প্রাক- তিরিশের কবির জন্য সাজানো আসরের বাইরে চলে এসেছেন। সে নায়ক কথারীতিকেই নিজেকে মোচন করার মাধ্যম বলে মেনে নিয়েছেন বিনা আড়ম্বরে। সুধীন্দ্রনাথ ও বিষ্ণু দে-র কবিতাতেই দেখা গেল যে তিরিশের বাঙালি মধ্যবিত্তের আত্মবিস্মৃতির আবরণকে ছিন্ন করতে চেয়ে প্রকৃত প্রস্তাবে বাঙালি মধ্যবিত্তের চেহারাকে তাঁরা তন্নিষ্ঠতায় স্পষ্ট করে তুলেছে। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু পর্যন্ত সভ্যতার ক্রমবর্ধমান সংকটের চেতনাই এঁদের কবিতায় মৌল আবেগ ভূমি ছিল। এবং যে আবেগ ভূমিতে কোনও আগাছা জন্মাতে পারেনি এঁদেরই বুদ্ধি কর্ষিত পরিচর্যার ফলে।

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে আধুনিক বাংলা কাব্যের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হলো। এখান থেকেই দ্বিতীয় পর্যায়ে কালগণনা শুরু হচ্ছে বটে, কিন্তু এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু একান্তই বাইরের ঘটনা- প্রকৃত ঘটনা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ক্রমবিস্তৃতি। প্রথম মহাযুদ্ধের পরোক্ষ প্রতিক্রিয়াগুলি আমাদের দূরাগত তরঙ্গের মতো আঘাত করেছিলো। ২য় মহাযুদ্ধ একে বারে আমাদের হাত ধরে ডাক দিলো। দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী প্রস্তুতি পর্বের প্রকৃত পরীক্ষা শুরু হলো এই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আলোড়নের কালে। কাব্যে কথারীতির প্রতিষ্ঠা রোমান্টিক কাব্যিক নায়কোক্তির স্থলে নিরাসক্ত চিত্ত নায়কের আলাপনের আয়োজন, চিত্রকল্পকে ধীরে ধীরে প্রতীক পরিণত করায় সাধনা, এক কথায় প্রসঙ্গের ও প্রকরণের মোকাবিলা করতে করতেই নিজ নিজ কবি সত্তার প্রকৃত স্বাক্ষরকে আয়ত করা- এই সমস্তেরই আয়োজন শুরু হয়েছিলো দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী পর্বে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বাস্তব ঘটনার যে তীব্র আধিপত্য বিস্তার করলো তাকে ব্যবহার করতে গিয়েই আধুনিক বাংলা কবিতার আদি রীতির আত্মপ্রত্যয় লাভও ঘটলো। তখন দেশ বিদেশের ঘটনাবলির বিশিষ্ট চাপে বিশ্ব নামক ব্যাপারটা বাঙালি মধ্যবিত্ত পাঠক মন্ডলীর কাছে নিজে নিজেই প্রত্যক্ষ হয়ে উঠছিলো। এই প্রত্যক্ষতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে উক্ত কালের জটিলতা সম্বন্ধেও বাঙালি দ্রলোক আর আগের মতো উদাসীন থাকলেন না। তাঁর অস্তিত্বকে তিনি বিশ্বগত জটিলতার অংশ বলেই চিনে নিতে পারলেন। স্বভাবতই তাঁদের মধ্যে যাঁরা কাব্য-পাঠক, তাঁরা তথাকথিত আধুনিক কবিতার মধ্যে নিজেদের ভাঙাচোরা, আঁকাবাকা অথচ যুযুধান অস্তিত্বের ছায়া খুঁজে পেলেন। আধুনিক বাংলা কবিতার আদি রীতির আত্মপ্রতায় লাভের মূলে চারের দশকের এই অবদান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ততোদিনে রবীন্দ্রনাথের আমি তুমি-কে স্থানচ্যুত করে বাঙালি কবিদের আমরা নতুন অর্থদ্যোতনা নিয়ে এসেছে। সে অর্থদ্যোতনায় এক প্রত্যয়ের গৌরব ক্রিয়াশালী ছিলো এবং এই প্রত্যয়ের গৌরব থেকেই চারের দশকের কাব্য চেতনায় জীবনের ব্যাপ্তি চেতনা এতো প্রাধান্য লাভ করেছে। অবশ্যই এই প্রাধান্য লাভ কাব্যিক সার্থকতার জন্য তৎপর হলে তবেই তাকে আমরা শিল্পের মর্যাদা দেবো। চারের দশকে রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী কবিদের কাছে এই সমস্যা কীভাবে প্রতিভাত হয়েছে তা এই কারণে বিশেষ করে বিচার্য।

কবিত্বের অনির্বচনীয় আহ্বানে সাড়া দিতে গিয়ে পুরোধা আধুনিক কবিবৃন্দ প্রথমেই সেই জীবন্ত ভাষাকে সন্ধান করেছিলেন, যা একদিকে ব্যক্তিত্বরূপের স্বাক্ষরবহ, অপরদিকে গদ্য-পদ্যের অযথা প্রতিযোগিতাকে প্রশ্রয় দেয় না। কাব্যের স্রোতস্বিনীই তরঙ্গের উপযুক্ত লীলাভূমি। তাই কাব্যে তাঁরা কথারীতিকে প্রতিষ্ঠা করতে চাইলেন আবেগের অসাধারণত্বকে অঙ্গীকার করেই। কবি অমিয় চক্রবর্তীর কাব্য সাধনা চারের এবং পাঁচের দশকে নিঃসন্দেহে এই দুই মেরুকে বাঁধবার চেষ্টা করেছে তাঁর ছন্দের বিচিত্র বন্ধনে। অমিয় চক্রবর্তী প্রশান্তির কবি। এই অর্থে তিনিই একমাত্র আধুনিক কবি রবি দীপ্তির শেষ রাগ যাঁর

জগৎ থেকে কোনওদিন মুছে যায়নি। বিষ্ণু দের কাছে রবীন্দ্রনাথ ঐতিহ্যের অন্তর্গত। সে শক্তিমান ঐতিহ্যকে তিনি মননের প্রতিবেশে লালন করে থাকেন। অমিয় চক্রবর্তীর কাছে রবীন্দ্র মানসিকতা প্রত্যক্ষ ব্যাপার। কোনওদিনই তিনি মৌল অর্থে un- Tagorean নন। গম্বুজ বা উঁচু বৃক্ষশ্রেণির ঋজুরেখা, বা কোনও শহরের আলোর বিন্দু অমিয়বাবুর কাব্যে প্রায়ই প্রসঙ্গ-ধৃত হয়। বৃক্ষ ইব স্তব্ধতার দিকেই তিনি অভিযাত্রী। অনির্বচনীয়কে তিনি খোঁজেন। এই গম্বুজ বা বৃক্ষ শ্রেণীর ঋজুরেখায় প্রতীকী ব্যঞ্জনা নেই- কিন্তু ধূলিধূসরিত জগতের ঊর্ধ্বশায়ী অনন্তের দিকে ইঙ্গিত করে এরা। অমিয়বাবুর প্রশান্তি একটি নৈসর্গিক হ্রদের সঙ্গে তুলনীয়। সীমান্তহীন সংসারের ছায়া পড়ে সেখানে। কখনও কখনও ঝড়ের মেঘও যে ছায়া ফেলে না তা নয়। কিন্তু তাতে নৈসর্গিক হ্রদের চরিত্র পাল্টায় না। আমরা যে এর তীরে গিয়ে দাঁড়াতে চাই তার কারণ এর অকৃত্রিমতা। চারের ও পাঁচের দশকের বাক্যসাধনায় ভাষার মুক্তি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় ভাষার মুক্তি ছন্দের মুক্তিকেও ত্বরান্বিত করেছে। এ প্রসঙ্গে ভাষার সংস্কার মুক্তির বিষয়ে অমিয়বাবুর কবি প্রকৃতির গতি ও প্রবণতাও লক্ষণীয়। অমিয় চক্রবতীর ভাষাও জীবনানন্দের মতো আবেগের নাটকীয়তা ধারণ করার ভাষ্য নয়। হাদা মৃদু ভাষণের পরিশীলিত পরিবেশই যে অধিকতর সাবলীলতা ভোগ করে থাকে। এখানে আবার জীবনানন্দের সঙ্গে তাঁর পার্থক্যও বটে। জীবনানন্দ এক নিজস্ব দার্শনিক মনোভঙ্গিকে সহায় করে বহু অসমকে একত্র ঠাঁই দিতে পারেন। তাঁর ভাষাতেও সেই বিষম সমাবেশের নিবিড় নিশিন বিদ্যমান। অমিয়বাবুর পক্ষে তা সম্ভব নয়। অমিয়বাবু নাট্যিকতাকে অনুভবই করেন না। জীবনানন্দ হয়তো অনুভব করেন। কিন্তু তিনিও তাঁকে পরিবর্জন করতে পারলেই তাঁর স্থিরতার ধ্রুবপদে আশ্রয় পান সহজে। চারের ও পাঁচের দশকে জীবনানন্দর প্রধান পরিবর্তন এই যে কবি জীবনের প্রাথমিক স্তরে যে মৃত্যু চেতনা বারে বারে সব কামনার শিয়রে এসে দাঁড়িয়েছে, তার হাত থেকে কবির কিছুটা মুক্তি ঘটেছে। জীবনানন্দের কবি জীবনের প্রাথমিক মৃত্যু বোধের পশ্চাৎবর্তী মানসিকতা আধুনিকতার বিষঙ্গকরণের যন্ত্রণাসঞ্জাত en-nui এর ফল। চারের ও পাঁচের দশকে দুর্ভিক্ষ যুদ্ধ ও সর্বব্যাপী মৃত্যুর মাঝখানে দাঁড়িয়ে কবির স্বাভাবিক মানবিক জিজীবিষা প্রবলতা লাভ করেছে। মানুষের অমল' ভবিষ্যতের কথা অতঃপর জীবনানন্দের কাব্যালয়ে স্থান পেলো। ইয়েটসিয় প্রতীকী রহস্য, কীটসিয় স্বাদু ইন্দ্রিয় গ্রহিতা এবং কচ্চিৎ কখনও ডিলা মেয়ারিয় স্বপ্নাচ্ছন্নতায় বিভোর পথিক জীবনানন্দের নিজ আকুলতা- অমিয়বাবুর মতোই, দেশজ প্রশান্তির নীড়ের জন্য। এই তাঁকে ভিতর থেকে টানে। এই জীবনানন্দের প্রিয় কবি প্রসঙ্গ-গম্বুজ এবং সরলরেখ বৃক্ষ যেমন অমিয়বাবুর। দ্বিতীয় সমরোত্তর কালে নীড়ের প্রতীকে জীবনানন্দ নীড় ভাঙা মানুষের অনেক কথা বলতে পারতেন। কিন্তু জীবনানন্দ অতীতকে যে আবেগে ধরতে পারলেন, অতীত এবং ভবিষ্যতের বর্তমানকে সে তুলনায় উলব্ধি করেননি। এই অপূর্ণতা জীবনানন্দের কবি জীবনের পরম স্বার্থকতার প্রতিস্থক হয়েছে। জীবনানন্দের কবি ব্যক্তিত্বের এই অপূর্ণতাজনিত সংকট 'বেলা অবেলা কালবেলা'য় বিশেষভাবে প্রতিফলিত।

আসলে জীবনানন্দও বুদ্ধদেবের মতোই রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যাকে এড়িয়ে আধুনিক কবির সমস্যাকে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ বিশুদ্ধ আধুনিকতা বলতে বুঝেছিলেন বিশ্বকে ব্যাক্তিগত আসক্তভাবে না দেখে বিশ্বকে নির্বিকার ভাবে দেখা। এই দেখাকে রবীন্দ্রনাথ বিশেষ কালের নিজস্ব দৃষ্টি সম্পদ বলে মানতে নারাজ ছিলেন। কিন্তু এই দেখাকেই তিনি বলেছেন উজ্জ্বল ও বিশুদ্ধ। নির্বিকার কথাটির তাৎপর্যে কবি আধুনিকতার গুরুত্ব নির্দেশ করেছেন। নির্বিকারত্ব অর্জনের জন্য অহমিকার একটি একটি আবরণ থেকে মনকে মুক্ত করে চলতে হয়। এবং যতক্ষণ না নিজ আত্মস্বরূপের, নিজ ব্যক্তিসত্তার নিরভিমান অকৃত্রিমতায়

গিয়ে পৌঁছানো যায়, ততক্ষণ এ চলার বিরাম নেই। অতঃপর কবি সেই ভাষাকে মূর্তি দেবার শক্তি আয়ত্ত করেন, কলিংউড যাকে বলেছেন সামাজিকের দুর্নিরীক্ষ গহন ভাষা। বুদ্ধদেব বসু আধুনিক কবিত্বের এই অভিজ্ঞানকে মানতেন না বলেই বিষ্ণু দেকে প্রশ্ন করেছিলেন, আপনার বন্ধু সুধীন্দ্রবাবুর মারফত জানলুম যে আপনার মতো এলিয়টভক্ত কখনও নিছক অন্তঃপ্রেরণার তাড়নায় কাব্য লেখেন না। তবে কিসের তাড়নায় লেখেন?' নিছক' কথাটিকে অবজ্ঞা করার জনাই সুধীন্দ্রনাথের বক্তব্যের নিহিতার্থ বুদ্ধদেববাবু হারিয়ে ফেলেছেন। অথচ বুদ্ধদেবও এলিয়টের দ্বারা সজ্ঞানে চিহ্নিত হয়েছেন। তাঁর কবিতায় ফাঁপা মানুষ ও পোড়ো জমির কথা তাঁর এলিয়ট অনুসৃতিরই ফল। এলিয়টের কাব্যানুকৃতির ফলে বুদ্ধদেব বসু হয়তো topical হয়েছেন, কিন্তু এই সব নয়, নিছক অন্তঃপ্রেরণা যে বেশি দূর নিয়ে যায় না, সজ্ঞান কাব্যপ্রয়াসের এক অনপসরণীয় ভূমিকা রয়েছে, তাঁর কাছ থেকেই সেটা বোঝা যায় 'দময়ন্তী কাব্যগ্রন্থের (প্রথম সংস্করণ) পরিশেষে সংযুক্ত আধুনিক কাব্য-প্রকরণের নির্দেশিকায়। বুদ্ধদেব আধুনিকতার ব্যাখ্যায় অন্যত্র বলেন যে, each generation has its own set of the moderns' and to claim for each a new and exclusive aesthetic quality is to deny continuity to history and unity to human nature'

জীবনানন্দও এই ব্যাখ্যাকে অনুসরণ করেন; বলেন, 'মানুষের মনের চির পদার্থ কবিতায় বা সাহিত্যে মহৎ লেখকদের হাতে যে বিশিষ্টতায় প্রকাশিত হয়ে ওঠে তাকেই আধুনিক সাহিত্য বা আধুনিক কবিতা বলা যেতে পারে।' এঁরা দু'জনেই আধুনিকতা অপেক্ষা চিরন্তনত্বের গভীর রহস্যকেই অধিকতর অনুধাবন করতে চান। এবং সেদিক থেকে জীবনানন্দ এবং বুদ্ধদেব প্রকারান্তরে রবীন্দ্রনাথের উক্তিকেই গভীরার্থ প্রদান করেন, 'এ কোনও বিশেষ কালের নয়। কিন্তু নির্বিকার তদ্‌গতভাবে দেখার তাগিদ সকল যুগে সমছন্দ নয়। দ্বান্দ্বিকতার তীব্রতায় কোনও কোনও যুগে এই তাগিদ স্বভাবতই জোরালো হয়ে ওঠে। সেই যুগে সচেতন কবিই নিজ কালখণ্ডে দাঁড়িয়ে ভবিষ্যতের আভাস রচনা করেন। এই কবিই আধুনিক কবি।

রচনা সূত্র -

১) রবীন্দ্র সমসাময়িক রচনা - ড: শৈবাল বসু।

২) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশেষ প্রবন্ধ - মনিময় দেববর্মা।

৩) ''সন্ধিক্ষণ'' সাহিত্য পত্রের কিছু আলোচনা।